স্বর্গীয় আলো

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ১-৫ পদ

প্রায় ১৪৫০-১৪১০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মোশির দ্বারা লিখিত এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর কর্তৃক এই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তাঁর আরাধনার জন্য এক জাতিকে পৃথক করার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। পুস্তকটির নামের অর্থ "আরম্ভ" বা "শুরু" বা "উৎস"। তাই, আদিপুস্তকে আমরা পৃথিবী, তথা মানবজাতি, তথা পরিবার, বা সভ্যতা বা মানুষের পরিত্রাণের শুরুর বিবরণ দেখতে পাই। এই সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র বাইবেলের প্রথম পুস্তক হিসাবে এর দ্বারা সমগ্র বাইবেলের বিষয়বস্তুর সূচনাও ঘটেছে— ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য (সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, বিচারকর্তা, পরিত্রাতা); মানুষের মূল্য ও মর্যাদা (ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণলাভকারী, পৃথিবীতে ঈশ্বর দ্বারা ব্যবহৃত; পাপের ফলাফল (পতন, ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ, বিচার); এবং পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা ও নিশ্চয়তা (চুক্তি, ক্ষমা, প্রতিজ্ঞাত মশীহ)। বাইবেল মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও কার্যের পুস্তক। এই মানুষের পরিত্রাণ পরিকল্পনা ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বেই সাধন করেছিলেন (ইফিষীয় ১.৪; প্রকাশিত বাক্য ১৭.৮); তাই পুত্র ঈশ্বরের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যু ছিল নির্ধারিত (প্রেরিত ২.২৩; ৪.২৭-২৮)। কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি নিহত হয়েছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১৩.৮)। এই সমস্ত বিষয়ের পূর্বাভাষ আমরা আদিপুস্তকে পাই (আদি ৩.১৫)।

আদিপুস্তকের প্রথম ১১ অধ্যায়ে ৪টি বড়ো ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে—

(১) সৃষ্টি (১-২)
(২) মানুষের পাপে পতন ও তার পরিণতি (৩-৫)
(৩) মহাপ্লাবন (৬-৯)
(৪) বাবিলে বিদ্রোহ (১০-১১)।

অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে ইস্রায়েল জাতির ৪ "কুলপতি" বা "আদি পিতৃপুরুষদের" প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে-

(১) অব্রাহাম (১২-২৫.১৮)
(২) ইস্হাক (২৫.১৯-২৭.৪৬)
(৩) যাকোব (২৮-৩৬)
(৪) যোষেফ (৩৭-৫০)

আজ আমরা আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি পদ থেকে সৃষ্টির প্রারম্ভিক বিবরণ থেকে শিখব। এই ৫টি পদে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর অন্ধকার, আকারহীন, শূন্য ও বিশৃঙ্খলতার (২ পদ) মধ্য থেকে এই সুন্দর (৩১ পদ) সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন। আজ যখন আমি বা আপনি আমাদের জীবনে একইভাবে অন্ধকার বা বিশৃঙ্খলতার ছাপ দেখতে পাই, তখন আমরাও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে পারি। কারণ, তিনিই পারেন একে সুন্দর আকার দিতে। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সৃজনশীল ক্ষমতার প্রয়োজন, তাঁর হাতে আমাদের জীবনকে সমর্পিত করতে হবে। কারণ, আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর মহান পরিকল্পনা আছে।

বাইবেলের শুরু হয়েছে ঈশ্বরের কাজ দিয়ে, অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি দিয়ে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পরিচিতির সামান্যতম বিবরণ দিয়ে নয়। হ্যাঁ, সরাসরি ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য দিয়ে এই বই-এর শুরু হয়েছে। এমন বিষয় একবিংশ শতাব্দীর মানুষের চোখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-পিপাসু একবিংশ শতাব্দীর মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির বিবরণ শোনার আগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ চায়। বাইবেল কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। কারণ, তিনি *"সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিচ্ছেন . . . তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা"* (প্রেরিত ১৭.২৫-২৮)। আমাদের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তেমনই তাঁর অস্তিত্বও সত্য। তথাপি, যুক্তিবাদী মানুষের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণার্থে যে যুক্তিগুলি সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেগুলি হল—

(১) কারণ ও ফলের যুক্তি *(Cosmological Argument)*— যেমন সমস্ত বিষয় বা ঘটনার পিছনে কারণ

আছে, ঠিক তেমনই এত বড় বিশ্বমণ্ডলের অস্তিত্বের পিছনেও যে কারণকে আমরা নির্দেশ করতে পারি, তা ঈশ্বর ছাড়া আর কী হতে পারে? বাতাস, বুদ্ধি, জীবন বা ভালোবাসার ন্যায় ঈশ্বরকে আমরা চোখে দেখতে না পেলেও বিশ্বমণ্ডলের বিভিন্ন ফল দেখে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য।

(২) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যুক্তি *(Teleological Argument)*— এই বিশ্বমণ্ডলের প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে সুসামঞ্জস্য, ক্রম বা বিন্যাস দেখে আমরা উপলব্ধি করি যে, সকলই একটি মহান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে চলেছে। ঘড়িকে দেখে যেমন তার কারিগরের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি; ঠিক একইভাবে, এই বিশ্বমণ্ডল ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

এ ছাড়াও আমরা (৩) জীব যুক্তি *(Ontological Argument)* বা (৪) নৈতিক যুক্তির *(Moral Argument)* কথাও বলতে পারি।

কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই সমস্ত যুক্তির সাহায্য নেবার পরিবর্তে আমরা যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে প্রশ্ন করি; তাহলে সহজেই উত্তর মেলে যে, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু জানা সম্ভব, তা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (রোমীয় ১.১৯-২১)। কিন্তু পাপ যখন আমাদের উপর রাজত্ব করে, তখন আমরা এই অভ্যন্তরীণ সত্য অনুভূতিকে অস্বীকার করি (রোমীয় ১.১৮, ২০, ২৩, ২৫)। এ ছাড়াও পবিত্র বাইবেল এবং প্রকৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে কেবল ঈশ্বরই পারেন আমাদের তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে। কারণ, পাপী মানুষ আত্মিক সত্য দেখতে পায় না (২ করিন্থিয় ৪.৪) বা জাগতিক জ্ঞানেও ঈশ্বরকে জানা যায় না (১ করিন্থিয় ১.২১)। তাই, আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের পরাক্রম বা ক্ষমতা কামনা করা, কেবল ঈশ্বরের পরাক্রমই পারে আমাদের সত্য বিশ্বাস দিতে।

এই ঈশ্বর আদিতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। একবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী মানুষ মহা বিস্ফোরণের *(Big Bang)* দ্বারা এই বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টির ধারণা তথা অভিব্যক্তিবাদকে *(Evolution Hypothesis)* বিশ্বাস করে, কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টিতত্ত্বকে আজগুবি গল্প বলে। কিছুদিন আগে দিল্লিতে বা পাকিস্তানে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে গেল, তা আমাদের কাছে এই সাধারণ শিক্ষাই দেয় যে বিস্ফোরণের দ্বারা যাই হোক না কেন, কোনও সুন্দর বা সৃষ্টিধর্মী ঘটনা ঘটতে পারে না। অথচ, যখন আমরা খোলা আকাশ বা হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে, এ সমস্তই এক মহা বিস্ফোরণের ফলাফল। আবার যে অভিব্যক্তিবাদের এত রমরমা, তা জড় থেকে জীবের উৎপত্তির আত্ম-বিরোধী তত্ত্বকে পূর্বধারণা *(presupposition)* বলে বিশ্বাস করতে বলে। এমন আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করা, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যে বিশ্বাস করা অপেক্ষা কোন্ অর্থে জ্ঞানবানের কাজ, তা আমার জানা নেই।

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি আমরা আমাদের দৃষ্টি দেব।

১। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস ঃ ৬ দিনের যে সৃষ্টির বর্ণনা ১ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তার শুরু হয়েছে শূন্য বা বিশৃঙ্খলতা থেকে, এবং তা ক্রমশ পূর্ণতা বা সুশৃঙ্খলতার উদ্দেশে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর বিন্যাস দান করেছেন। ১ম দিনে ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করেছেন, এবং ৪র্থ দিনে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, যারা দিন ও রাতের উপর রাজত্ব করবে। ২য় দিনে ঈশ্বর বিতানের উপরের জল থেকে নিচের জলকে পৃথক করেছেন, ৫ম দিনে আকাশে পাখিদের এবং জলে মাছদের সৃষ্টি করেছেন। ৩য় দিনে ঈশ্বর জল থেকে ভূমিকে পৃথক করেছেন, ৬ষ্ঠ দিনে গৃহপালিত ও বন্য বিভিন্ন পশু ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথম ৩ দিন পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে, শেষ ৩ দিন প্রাণকে আনয়ন করে সেই পরিবেশকে পূর্ণ করা হয়েছে।

২। শূন্য থেকে সৃষ্টি ঃ ঈশ্বরের মুখ থেকে কথা বের হবার আগে কিছুই ছিল না। এখানে সৃষ্টির জন্য যে হিব্রু ক্রিয়াপদ *(bara)* ব্যবহার করা হয়েছে, পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বাক্যে তার কর্তা হিসাবে কেবল ঈশ্বরকেই দেখতে

পাওয়া যায়। কারণ, শূন্য থেকে কোনও কিছুর আকার কেবল ঈশ্বরই দিতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম শক্তিতে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, ঈশ্বরের সমকক্ষ কেউ নেই বা ঈশ্বরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অনন্তকাল ধরে কোনও কিছুই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। তাই, যোহন ১.৩ পদে বলা হয়েছে, "যা কিছু হয়েছে, তার কিছুই তিনি ব্যতিরেকে হয়নি।" আবার কলসীয় ১.১৬ পদে বলা হয়েছে, ". . . সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে।" রোমীয় ১১.৩৬ পদে বলা হয়েছে, "সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত।" ইব্রীয় ১১.৩ পদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং কোনও প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তু উৎপত্তি হয়নি।" এই শিক্ষা আমাদের "সর্বেশ্বরবাদ" থেকে দূরে রাখে। এইভাবে, সমস্ত বিষয় শূন্য থেকে সৃষ্টি করায় কেবল ঈশ্বরই পারেন এই সৃষ্টির রক্ষা, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করতে।

৩। বাক্য দ্বারা সৃষ্টি ঃ ৩ পদে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ছিল, বলা হয়েছে। হিব্রু বাইবেলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা "বাতাস" ও "আত্মা" — এই উভয় অর্থেই বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে "ঈশ্বরের সৃজনশীল আত্মা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বরের আত্মাকে জলের উপর থাকার দ্বারা পাখিদের মধ্যে মায়েরা যে ভাবে বাচ্চাদের আগলে রাখে (২বিবরণ ৩২.১১-১২; যিশাইয় ৩১.৫); ঠিক সেইভাবে, সৃষ্টিতে ঈশ্বরের আত্মার সক্রিয় অংশগ্রহণকে নির্দেশ করা হয়েছে (ইয়োব ৩৩.৪; গীত. ১০৪.৩০)। ঈশ্বরের কথা বা বাক্য শক্তিযুক্ত। তাই, এই বাক্যের দ্বারাই ঈশ্বর সমস্ত কিছুর সৃষ্টি করেছেন। দায়ূদ তার গীতে বর্ণনা করেছেন, "আকাশমণ্ডল সৃষ্টি হল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাঁহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে" (গীত. ৩৩.৬)। ঈশ্বরের মুখনির্গত বাক্য কেবল সৃষ্টি নয়, কিন্তু তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বিষয়কে ধারণ করেও আছে (ইব্রীয় ১.৩)।

প্রথম দিনে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা "আলো" সৃষ্টি করলেন এবং অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করলেন। এই আলো কোনও সূর্য বা চন্দ্রের আলো নয়, কিন্তু স্বর্গীয় আলো। কারণ, ঈশ্বর ৪র্থ দিনে সূর্য বা চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তাই, ৩ পদে উল্লেখিত আলোর উৎস স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি জ্যোতি (যোহন ১.৪-৫)। সৃষ্টির শুরুতে যে স্বর্গীয় আলোয় ঈশ্বর পৃথিবী আলোকিত করেছিলেন, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে ঈশ্বর তার দ্বারা আবার আমাদের আলোকিত করবেন— "লোকদের প্রদীপের বা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের আলোকিত করবেন" (প্রকাশিত বাক্য ২২.৫)।

এখানে, আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি যে, ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করলেও, অন্ধকারকে লুপ্ত করেননি। তাই, সন্ধ্যা ও সকাল হবার সুযোগ ছিল। অবশ্য ৪র্থ দিনে, সূর্য সৃষ্টি হবার পর যে ২৪ ঘন্টার দিন ও রাত আমাদের কাছে পরিচিত; তার সঙ্গে প্রথম তিন দিনকে একইভাবে দেখার কোনও প্রয়োজন নেই।

ঘোর, শূন্য, অন্ধ কারময়, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে যেমন ঈশ্বর সুশৃঙ্খল করেছিলেন, এবং সেই কাজের সূচনা তিনি তাঁর স্বর্গীয় আলোর দ্বারা সাধন করেছিলেন; ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ শুরু করেন। তিনি আমাদের অন্ধকারময়, বিশৃঙ্খল জীবনে আলো হয়ে উদিত হন, যার ফলস্বরূপ আমরা আশা, প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যত আবিষ্কার করি। এর দ্বারা আমরা "যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাই" (২করি. ৪.৬)। এখানেই শেষ নয়, এর দ্বারা আমরা জগতের জ্যোতি হিসাবে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করি (মথি ৫.১৪-১৬)।

মিশরের প্রতি মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে ১০টি আঘাত এনেছিলেন, তার ৯ম আঘাত ছিল ৩দিন যাবৎ রাত্রি (যাত্রা. ১০)। যদিও মিশ্রীয়রা ৩দিন যাবৎ বিছানা ছাড়েনি, ইস্রায়েলীয়রা আলো উপভোগ করেছিল। আমাদের চারপাশে অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর পারেন সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আলো ফোটাতে। তাঁর আলো যত আমাদের জীবনে প্রকাশিত হবে, ততই আমাদের জীবনের বিভিন্ন পাপ আমাদের চোখে পড়বে, যেগুলিকে আমাদের ছাড়তে হবে।

আপনি কি আপনার বিশৃঙ্খল, অন্ধকারময় জীবনে তাঁর প্রকৃত আলোর সন্ধান পেয়েছেন?

হিসাবে কল্পনা করে? আপনি কি আপনার নিজের ক্ষমতায় তাঁর সামনে নিজেকে যোগ্য হিসাবে আপনার জীবনের নিকাশ দিতে উপস্থিত করবেন? নাকি আপনাকে সৃষ্টির পিছনে তাঁর ভালোবাসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্বীকার করে, তাঁর ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যীশু খ্রীস্টকে আপনার ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও প্রভু বলে স্বীকার করে, তাঁর তৈরি পথে তাঁর কাছে নিজেকে উপস্থিত করবেন? আমাদের প্রত্যেককে একদিন তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। একবারও কি আপনি ভেবে দেখেছেন, তাঁর সামনে আপনি কীভাবে উপস্থিত হবেন? যীশু খ্রীস্টের ধার্মিকতা পরিধান করে, না আপনার পাপ ও স্বার্থপরতার আত্মগরিমা পরিধান করে?